Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 314 - 320
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ভক্তি সাধনা, মানবপ্রেম ও রবীন্দ্রনাথ

দোলন ঘোষ
স্যাক্ট -১, দর্শন বিভাগ
ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজ
Email ID: dolanghoshmail@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bhakti Sadhana, Medieval India, Saints like Kabir, Dadu, Nanak, Poem-Doha, Rabindranath Tagore's poems, songs, Universal brotherhood.

Abstract
How many sages, saints have been born in our country over the ages; They have taught people to love beyond caste and religious bigotry. I can name a few Mahatmas in medieval India who showed people the path of love through their devotion to God and Sadhana. Saints like Saint Kabir, Dadu, Sadhika Meerabai, Guru Nanak, Rajjab, Sri Chaitanya can be mentioned among them. Also, there were many others in India at that time who spoke the message of human love in their poetry. In the modern era, we see the reflections of the sadhanas of those medieval saints in the poems, songs and various writings of poet Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore's poem Gitanjali is one of the proofs. There is no doubt that Kabiguru's writings will enlighten people with the light of love, sadhana and world brotherhood even today.

Discussion

ভূমিকা : মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে মোঘল রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম বিভেদ ছিল না যে তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রবলভাবে সমাজকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু সেই সময়ে সন্ত কবীর, দাদূ, শিখ গুরু নানক, সাধিকা মীরাবাঈ, রজ্জব, প্রমূখ আরো অনেকেই জন্মেছিলেন যাঁরা তাঁদের ঈশ্বর ভক্তি ও মানব প্রেমের বাণীতে সেই যুগেও মানুষকে প্রেম ও সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পথ দেখিয়েছেন তাঁদের কবিতা, দোঁহা ইত্যাদির মাধ্যমে। আধুনিক যুগেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে, কবিতায়, বিভিন্ন লেখায় মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সেই সন্ত-কবীদেরই প্রভাব দেখতে পাই। আমি এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সেই সকল সন্ত-মহাত্মা-কবীদের কয়েকজনের সম্বন্ধে আলোচনা করে রবীন্দ্রকাব্যে, গানে ও বিভিন্ন লেখায় সেই সকল সন্ত-কবীদের কতটা প্রভাব পড়েছে সেই বিষয়েও আলোচনা করব।

মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের মূল সুরটিই ছিল ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধি করা। মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় নয়, কেবল মানব অন্তরে ঈশ্বরের মনন-চিন্তন। মধ্যযুগের সেই সকল সন্ত-মহাত্মাদের কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হল –

সন্ত কবীর : বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক রামানন্দের শিষ্য ছিলেন সন্ত কবীর। আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। এটিও অনুমিত যে তিনি হিন্দু বিধবা ব্রাহ্মণ নারীর সন্তান কিন্তু তিনি লালিত পালিত হয়েছেন দরিদ্র

মুসলমান জেলে পরিবারে। সন্ত কবীরের উপর হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্ম মতেরই প্রভাব পড়েছিল এবং তত্কালীন ধর্মে ধর্মে বিভেদের পরিমন্ডলে তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মানুষদের পরস্পরের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা। রাম ও আল্লাহ্ তাঁর কাছে এক। অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো মনে করেন যে কবীর ইসলামী একেশ্বরবাদী ধারণাকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চেয়েছেন। সন্ত কবীরের কাছে রামই পরমেশ্বর এবং কবীর মূর্তিপূজা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়গুলিকে সমর্থন করেন নি। কবীর বলছেন –

"জো খোদায় মস্‌জিদ বসতু হৈ, ঔর মুলুক কেহি কেরা।
তীরথ মুরত রাম নিবাসী, বাহর করৈ কো হেরা।।
পূরব দিশা হরিকো বাসা, পশ্চিম অলহ মুকামা।
দিল মেঁ খোজী দিলহিমা খোজো, ইহৈ করীমা রামা।।
জেতে ঔরত মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্‌হারা।
কবীর পোংগারা অলহ রামকা সো গুরু পীর হমারা।।"[১]

অর্থাৎ খোদা মসজিদে থাকলে বাইরের মুলুক কার? আর রাম যদি মন্দিরে থাকেন তাহলে বাইরেটা কে রক্ষা করবে? পূর্বে রয়েছেন হরি আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম রয়েছে। নিজেদের হৃদয়ে খুঁজে দেখ এখানেই আল্লা-রাম রয়েছেন। সকল নর, নারী তো তোমারই রূপ প্রভু। কবির সেই আল্লা-রামেরই সন্তান, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

দাদূ : দাদূ দয়াল (১৫৪৪-১৬০৩) কবীর পরবর্তীকালীন এক ভক্ত-কবি। সাধু সুন্দরদাস ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। অন্তরাত্মার মধ্যেই ভগবানের বাস। সেই ভগবানের প্রেমে যে সাধু-সন্তগণ লীন হন, তাঁরা কখোনোই সংকীর্ণ জাত-পাতের সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলির মধ্যে থাকতে পারেন না – এই রূপ ছিল ভক্ত দাদূ দয়ালের বিশ্বাস। দাদূ বলেছেন –

"অতম মাঁহে রাম হৈ পূজা তাকী হোই।
সেবা বংদন আরতী সাধ করৈঁ সব কোই।।"[২]

অর্থাৎ আত্মার মধ্যেই রাম (ভগবান) রয়েছেন। সেখানেই তাঁর পূজা হয়। সেখানেই সাধুগণ তাঁর সেবা, বন্দনা, আরতী করে থাকেন।

দাদু আরো বলেছেন –

"নীচ উঁচ মধিম কো নাঁহী।
দেখৌ রাম সবনি কে মাহী।।"[৩]

অর্থাৎ নীচ, উঁচ, মধ্যম ভেদাভেদ কিছু নেই। দেখো রাম (ভগবান) সকলের মধ্যেই রয়েছেন।

সাধিকা মীরাবাঈ : কবীর পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে সাধিকা মীরাবাঈ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন রাজস্থানের রাজার কন্যা এবং রাজার বধু। সাধিকা মীরাবাঈ তাঁর বেশির ভাগ ভক্তিগীতি তাঁর স্বামী মারা যাবার পরই রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সমসাময়িক লেখক পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'মীরার গান ও বসন্তোৎসব' প্রবন্ধে সাধিকা মীরাবাঈ-এর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে মীরাবাঈ ছিলেন জন্মসিদ্ধ কবি। বেল্‌ভেডিয়ার প্রেসের গ্রন্থে তিনি মীরাবাঈ এর বিখ্যাত ভজনটির উল্লেখ করেছেন -

"মেরে গিরধর গোপাল দূসরো না কোঈ। ...
তাত মাত ভ্রাত বংধু আপনা নহিঁ কোঈ।।"[৪]

অর্থাৎ আমার কেবল গিরিধারী গোপালই আছেন, আর কেউ নেই। মা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় কেউই আপন নয়। এই ভাবে ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁকে সাধনা করেছেন মীরাবাঈ। পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সাধিকা মীরাবাঈ-এর গানে সন্ত কবীরের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। বাইরে কোথায় খুঁজব ঈশ্বরকে? মন্দিরেও নয়, মসজিদেও নয়, সেই এক ঈশ্বর রয়েছেন আমার অন্তরে। তিনি ছাড়া জগতে আর কিছুই সত্য নয়।

রজ্জব : দাদূর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন সাঙ্গান-ফতেপুর নিবাসী কবি ও সাধক রজ্জবজী। কবীর ও দাদূর মত তিনিও ধর্মীয় গোঁড়ামীতে বিশ্বাস করতেন না। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্যই তিনি তাঁর দোঁহাগুলি রচনা করেন এবং বলা বাহুল্য যে সেগুলি কোন ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি বলেছেন –

> "রজ্জব বসুধা বেদ সব।
> কুল আলম কুরাণ।।
> পন্ডিত কাজী ব্যর্থ রৈ।
> দপ্তর দুনিয়া যান।
> সৃষ্টি শাসতর হে সহী।
> বেত্তার করৈ বখান।।"[৫]

অর্থাৎ সকল বসুধা বা বিশ্বচরাচরই বেদ, সমগ্র সৃষ্টিই কোরান। কয়েকটিমাত্র শুষ্ক কাগজ সমষ্টিকেই সমগ্র জগত মনে করে পন্ডিত ও কাজীগণ ব্যর্থ হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সাধকের হৃদয়ই কাগজ, যার মধ্যে প্রাণের অক্ষরে সকল সত্য লিখিত রয়েছে। মানব হৃদয়ের পরস্পরের মিলনে যে বিরাট মানব ঐক্যবন্ধন গঠিত হয়, তারই মধ্যে বেদ আর কোরান প্রদীপ্যমান হয়। বাইরের সেই কৃত্রিম বাধা দূর করে হে রজ্জব তুমি প্রাণের সেই বেদ, জীবনের সেই বেদ পাঠ কর। কতটা জীবনমুখী দর্শনের অভিসারী ছিলেন এই সকল সাধকগণ, তা তাঁদের এই সকল দোঁহা থেকেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু : বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক হিসাবে এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ সাধক হিসাবে যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খ্রীঃ অবধি তাঁর সময়কাল মনে করা হয়। হিন্দু-মুসলমান, পন্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ সকল মানুষের মধ্যেই শ্রীচৈতন্য তাঁর মতাদর্শ সকল জীবে দয়া, সকল মানুষে সাম্যতা এবং ঈশ্বরে গভীর ভক্তির বাণী প্রচার করেন। তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করে এবং মানুষকে নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত করে, ছুত-অছুত বিষয়কে পরিত্যাগ করে তিনি সকল মানুষকে সমান জ্ঞান করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। লেখক সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে মহাপ্রভুর শিক্ষা দ্বারা বাংলার জাগরণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন –

> "সুকুমার সেনের ভাষায় 'ইহাই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ'।"[৬]

গুরু নানক : মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক হিসাবে আমরা শিখগুরু নানকের নাম করতে পারি; তাঁর সময়কাল ১৪৬৯ – ১৫৩৮ খ্রীঃ। লাহোরের কাছে তালবন্দী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কেরানীর কাজ করতেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কা এমনকি বাগদাদ পর্যন্ত গমন করেন। তিনি মনে করতেন বিবাহিত হয়েও মোক্ষলাভ করা যেতে পারে। জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী গুরু নানক সর্বদাই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর জোড় দিয়েছিলেন। অনেক মুসলমান ব্যক্তি নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লেখক সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে গুরু নানক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন –

> "অধ্যাপক কে আর কানুনগো মনে করেন, মধ্যযুগে ভারতের অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীগুলির চেয়ে গুরু নানকের ধর্মের মধ্যে ইসলামের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মের মধ্যে এক সমন্বয়বাদী বিকল্প ধর্মচর্যা উপস্থাপিত করেন।"[৭]

গুরু নানক মনে করতেন ঈশ্বর এক। একদিন না একদিন আমাদের সকলকেই এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে, তাই এই পৃথিবীতে যতদিন বাঁচবে মানুষ ততদিন সে যেন কোন অহংকার না করে।

মধ্যযুগীয় সাধক ও কবিদের সাধনার বৈশিষ্ট্য : মধ্যযুগীয় কবি-সাধকগণের সাধনার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা মনে করতেন সাধকের অন্তরই মন্দির বা মসজিদ। পরমসত্য বা ঈশ্বরকে তাঁরা অন্তরেই অনুভব করতেন। ফলে সকল ধর্মশাস্ত্রগুলিকেও তাঁরা বাইরে খোঁজেন নি বা ধর্মশাস্ত্রগুলির শুকনো পাতাগুলির মধ্যে তাঁরা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার কোন রসই খুঁজে পাননি। জীবসেবার মাধ্যমেই তাঁরা জগতের মূল সত্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান, জাত-পাত এইরূপ কোন বিভেদই ঐ সকল সাধকগণ মানেননি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' – এই চিরন্তন সারসত্যকেই তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যে, গানে ও বিভিন্ন রচনায় মধ্যযুগীয় সাধকদের প্রভাব : কবিগুরু তাঁর একান্ত কাছের বন্ধু শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনের কাছ থেকে সাধক রজ্জবজীর একটি বাণী পেয়েছিলেন, সেই বাণী প্রসঙ্গে কবিগুরু তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলছেন –

"সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঠ
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।।"[৮]

অর্থাৎ সকল সত্যের সঙ্গে যে সত্য মেলে তাই প্রকৃত সত্য, তা না হলে তা মিথ্যা। রজ্জব বলছে এই কথাই সত্য, এতে তুমি আনন্দিতই হও আর রাগই কর। যুগে যুগে সাধকগণ ধর্মের ক্ষুদ্র আচার-আচরণে আবদ্ধ না থেকে মানুষকে যে প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন, সেখানে ক্ষুদ্র জাত-পাত, সংস্কার কিছুই আর সত্য থাকে না, জীব প্রেম, জীব সেবাই প্রকৃত সত্য হয়ে ওঠে। কবিগুরুও তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে ক্ষুদ্র সংস্কারগুলিকে অতিক্রম করেই 'বড় আমি' হয়ে ওঠার পথনির্দেশ করেছেন।

গুরু নানকের বানীর দ্বারা প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ নানকের দোঁহার অনুবাদ করে এই অসাধারণ গানটি লিখেছেন যেখানে মহাকাশের রবী, চন্দ্র, তারকা সকলেই যেন সেই মহাকাল ঈশ্বরের আরতীর দীপ; মলয় ও পবন আর সকল বনরাজি যেন যথাক্রমে সেই মহাকালের ধূপ, চামর ও ফুলন্ত জ্যোতির মত তাঁর আরতীতেই নিমগ্ন।

"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে
তারকামন্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি, হে ভবখন্ডন, তব আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।"[৯]

আবার কবীর যেখানে বলছেন – যেখানেই ঈশ্বরকে আমরা খুঁজি না কেন পরমাত্মা ঈশ্বর আমাদের খুব কাছেই রয়েছেন। মন্দিরে, মসজিদে, কাবায় অথবা কৈলাশে, কোন তীর্থে বা কোন মূর্তির মধ্যে তাঁকে পাওয়া যাবে না। কেননা তিনি যে আমাদের অন্তরেই রয়েছেন। কোন কঠিন তপস্যায়, কোন পূজা-পার্বনে বা শাস্ত্রপাঠে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাঁকে খুঁজলে মানুষের বিশ্বাসের বন্ধনেই তাঁকে পাওয়া যাবে। অধ্যাপক জি. এন. দাস কবীরের দোঁহার এই ভাবে ইংরাজী ভাবার্থ করেছেন -

"Wherever do you seek me man
I am close, quite close to you.
Nor in sacred places I am
Not in temple idols either
Not in solitary places I remain
I am close, quite close to you.
I stay not in temple or in mosque
Nor in Kabba or Kailash either
I remain close, quite close to you..."[১০]

একই ভাবে রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে দেখিয়েছেন,

"তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।"[১১]

অর্থাৎ একই ভাবে কবিগুরুর জেনেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর কাছেই আছেন, তিনি তাঁর আপনার ধন। তাঁর (ঈশ্বরের) মাঝেই কবির সকল আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবি এই কথাটি যেন তাঁর প্রাণের প্রভু ঈশ্বরকে জানাতে আকুল হয়ে উঠেছেন। আবার আর একটি গানে কবি বলেছেন -

"কে গো অন্তরতর সে!

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 314 - 320
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমার চেতনা আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে।।"[১২]

একইভাবে আর একটি জায়গায় কবি বলেছেন –

"হে অন্তরের ধন
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন।।
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী-
কোথায় যে বাহিরে আমি ঘুরি সকল ক্ষণ।।
হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।"[১৩]

অর্থাৎ বিশ্বকবিও সন্ত কবীরের মতনই ঈশ্বরকে খুঁজেছেন অন্তরে। ঈশ্বর কবিগুরুর কাছেও অন্তরের ধন। অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে খুঁজতে মন্দির, মসজিদ বা গীর্জায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি তো আছেন অন্তরে। আমরাই কেবল ঈশ্বরকে বাইরে খুঁজে বেড়াই। আবার কবিগুরুর 'অপমান বর' কবিতায় দেখি দুষ্টা রমণীর মন পরিবর্তনের পর তার মুখ দিয়ে কবিগুরু প্রশ্ন তুলেছেন –

"পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে!
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান!"[১৪]

এর উত্তরে কবিগুরু সন্ত কবীরের দ্বারা এই উক্তি করালেন যে – "জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।"[১৫] অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ মনে করেরছেন যে, ভক্তিবাদের মূল সুর এইটিই। এর দ্বারাই মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ভক্তিবাদের উদারতাকে বোঝা যায়। যেখানে জাত-পাত, নারী-পুরুষ এর কোন বন্ধনেই না থেকে সকল মানুষকে প্রভু বা ঈশ্বরের দান মনে করে তাকে কাছে টেনে নেওয়া যায়। অতি সহজেই অন্যের অতি বড় অপরাধও ক্ষমা করে দেওয়া যায়। যেভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান প্রবর্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবও জাত-পাত নির্বিশেষে সকল মানুষকে প্রেমের বাণী শুনিয়েছিলেন। একের অপরাধে অন্যকে ক্ষমা করতে শিখিয়েছিলেন।

বিশ্বকবি তার 'স্ত্রীর পত্র' নামক ছোটগল্পে সাধিকা মীরাবাঈ -এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মৃনালের জবানিতে জানিয়েছেন –

"তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি – ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল – তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্য মরতে হয় নি। মীরাবাই তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু – তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব। আমিও বাঁচলুম।"[১৬]

মধ্যযুগের সাধিকা মীরাবাঈ-এর তত্কালীন সমাজের ক্ষুদ্র আচার-ব্যবহারের প্রতি যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং নিজের লক্ষ্যে নিশ্চল থাকা – অর্থাৎ যেই আমাকে ছাড়ুক আমি তোমারই সাধনা করব প্রভু – মীরাবাঈ-এর এইরূপ জীবনদর্শন এবং স্বামীহারা হয়েও সাধিকা মীরাবাঈ যে নিজের জীবন শেষ না করে অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করে ঈশ্বরের সাধনায় নিজের বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন ও তাঁর আসাধারণ ভক্তিগীতিগুলি রচনা করেছিলেন, তাঁকেই স্মরণ করে মৃণালও তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিবিধ আচার-বিধির বিরুদ্ধে সোচ্চারে সরব হয়েছিলেন তাঁর পত্রে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই কবীর, দাদু, নানক, সাধিকা মীরাবাঈ প্রমুখ সন্ত মহাত্মাদের মুল সুরটি একই। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বাস। তাই বিশ্বকবি গেয়ে উঠেছেন –

"নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার-
আজ লব তাঁর দেখা।"[১৭]

অর্থাৎ দেবতারূপী প্রভু ঈশ্বর তো রয়েছেন আমার প্রাণেরই গভীরে লুকিয়ে। বাইরে কেন তাঁকে খুঁজব? তাই মধ্যযুগের সাধকদের বানী এই যে, নিজ অন্তরেই রয়েছে অতল সাগর। সেখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়। আর তা হল অপর জীব

তথা মানুষের প্রতি গভীর প্রেম অনুভব। তাই সাধকগণ মনে করেছেন বাহির পানে না তাকিয়ে এবার অন্তর পানে তাকাবার সময় হয়েছে।

> "আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি। তোমায় দেখতে আমি পাইনি। বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি।।"[১৮]

চন্ডীদাস যেমন বলেছিলেন,

> "শুনহ মানুষ ভাই
> সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"[১৯]

অর্থাৎ তৎকালীন সকল সন্ত-কবীগণ সহজ ভাষায় হৃদয়ের গভীরে লুকানো দেবতারূপী মানুষটিকে খুঁজতে চেয়েছেন, যে মানুষ অপর মানুষের প্রতি তথা সমগ্র জীবের প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করে এবং উঁচু-নীচু, জাত-পাত, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ না করে মানুষকে মানুষ জ্ঞানেই ভালোবাসতে শেখায়। এই প্রেমই কবিগুরুর বিশ্বপ্রেম, যার দীক্ষা কবি আমাদের দিয়ে গেছেন তাঁর সারা জীবনের রচনার মধ্য দিয়ে।

Reference:

১. কবীর, ৩, ২
২. পরচা অংগ, ২৬১
৩. দাদূ, পদ ৪০২
৪. সেন, ক্ষিতিমোহন, সাধক ও সাধনা, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস, সি, ব্যানার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০১০, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা ২০০৩, পৃ. ১৯৫
৫. সেন, ক্ষিতিমোহন, সাধক ও সাধনা, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস, সি, ব্যানার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০১০, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা ২০০৩, পৃ. ৪০১
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্র কাব্যে ইতিহাসচারণা ঐতিহ্যচেতনা ও আধুনিকতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৬, প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী ২০১৯, পৃ. ১৭৫
৭. ঐ, পৃ. ১৭৬
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা – ১৭, পৌষ ১৩৯৬ : ১৯১১ শক, মানুষের ধর্ম, পৃ. ৬৪৪
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ১৩, প্রকাশ – আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ৮২৭
১০. রবীন্দ্রকাব্যে ইতিহাসচারণা ঐতিহ্যচেতনা ও আধুনিকতা, সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৬, প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী ২০১৯, পৃ. ১৮৩
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ - ভাদ্র ১৩১৭, ৫২ নং গান, পৃ. ৭৬
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ১৩, প্রকাশ – মাঘ ১৩৪৮, পৃ. ২০৭
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ১৩, প্রকাশ – মাঘ ১৩৪৮, পৃ. ৬১
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা – ১৭, ভাদ্র ১৩৯৪ : ১৯০৯ শক, (কথা, অপমান-বর), পৃ. ৪৯
১৫. ঐ

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা – ১৭, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ : ১৯১০ শক (গল্পগুচ্ছ, স্ত্রীর পত্র), পৃ. ৩৩৮

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ - ভাদ্র ১৩১৭, ৫০ নং গান, পৃ. ৭৪

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ১৩, প্রকাশ – মাঘ ১৩৪৮, পৃ. ২৬

১৯. সেন, ক্ষিতিমোহন, সাধক ও সাধনা, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস। সি। ব্যানার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০১০, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা ২০০৩, পৃ. ২২৪

Bibliography:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা – ১৭, পৌষ ১৩৯৬ : ১৯১১ শক

ঐ, দশম খন্ড, পৌষ ১৩৯৬ : ১৯১১ শক

ঐ, দ্বাদশ খন্ড, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ : ১৯১০ শক

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ - ভাদ্র ১৩১৭

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ১৩, প্রকাশ – মাঘ ১৩৪৮

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ১৩, প্রকাশ – আশ্বিন ১৩৫৭

সেন ক্ষিতিমোহন, সাধক ও সাধনা, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস। সি। ব্যানার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০১০, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রকাব্যে ইতিহাসচারণা ঐতিহ্যচেতনা ও আধুনিকতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৬, প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী ২০১৯